যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১২ জুন ২০১৭

কলকাতা

৮ পাতার এই ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

থার্ডআই ক্লিক: অফবিট কলকাতা

বর্ষাকাল কারওর কাছে প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে ছাতা মাথায় গাড়ির জন্যে অধীর অপেক্ষা তো কারোর কাছে অন্যরকম ভালোলাগা। আবার বর্ষা মানে গরমের প্রচণ্ড হাঁসফাঁস থেকে মুক্তিও বটে। কলকাতার আদ্যোপান্ত লেগে আছে ব্যস্ততার রেশ। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা চাকরিজীবীদের কাছে অফিস মানে টাইমে ঢোকা টাইমে বেরোনো। একটা ছকেবাঁধা জীবন। এই অফিসটাইমেই কারোর কাছে জানলার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টিভেজা শহর দেখা, হয়তো সারাদিনের জমে থাকা ক্লান্তির অক্সিজেন...

ফোটো: **প্রলয় হাজরা** | লেখা: **তন্ময় মণ্ডল**

আমার চোখে কলকাতা

কল্যাণ সেন বরাট (সংগীত পরিচালক)

আমরা একেবারে পাক্কা ঘটি কলকাতার মানুষ। ২৭/৩ বৈঠকখানা রোডে আমাদের আদি বাড়িতেই আমার জন্ম। আমাদের সময়ের সেই কলকাতাটা আমার মনে হয় অনেক বেশি সুন্দর ছিল। অনেক বেশি আত্মার মিল ছিল সকলের সাথে সকলের এবং সেই রকে বসে আড্ডা মারা থেকে শুরু করে সকালবেলা কচুরি-জিলিপি খাওয়া সেই ব্যাপারগুলো বা মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল খেলার যে মজা বা টেস্ট খেলা দেখার একটা টিকিটের জন্য হা-পিত্যেশ করে মরা এই ব্যাপারগুলো মিস করি। হয়তো এখন কলকাতা অনেক ঝাঁ-চকচকে হয়েছে কিন্তু প্রাণটা কোথাও যেন হারিয়ে গেছে। কলকাতায় আমার অন্যতম ভালোলাগার জায়গা ছিল কফি হাউস আর আউট্রাম ঘাট। এখন তো আর যাওয়া হয় না, তাই জানি না এখন কেমন আছে! কফি হাউসের সেই মজাটা এখনও আছে কিনা জানি না। আর একটা জিনিস যেটা খুব মিস করি সেটা হল অনুষ্ঠান। আগে প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় যে মাচা বেঁধে সারারাত ধরে অনুষ্ঠান হতো, সেটা খুব মিস করি। তবে একটা কথা ঠিক কলকাতা আছে কলকাতাতেই। কলকাতার এত আলো আমার আধিক্য মনে হয়। আমার জীবনের শুরু তো গ্যাসের আলো দিয়ে। তাই আলো-আঁধারি কলকাতাকে ভীষণ ভালো লাগে। যদিও জানি ওই কলকাতা এখন অচল। আলোকসজ্জা দেখে যে খারাপ লাগে সেটা বলব না, তবে এগুলোকে আমার যেন ব্রাইডাল মেকআপ মনে হয়। স্থায়ী সৌন্দর্যকরণ যদি হয়, এগুলো ঠিক তা নয় মনে হয়। আর ভারতের যে কোনও মেট্রো শহরগুলোর পলিউশনের অবস্থা তো খুবই সংকটজনক। সেখানে কলকাতার পলিউশন তো এখন হসপিটালে গিয়ে পৌঁছেছে। নিরাপত্তাব্যবস্থা তো খুবই খারাপ। মেয়েদের সিকিউরিটি তো তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। সমস্ত ফুটপাথ দখল হবার ফলে আমাদের রাস্তা দিয়েই হাঁটতে হয়, ফলে অ্যাক্সিডেন্টও বেড়েছে। আমি বলব না যে সরকার একেবারেই আন্তরিক নয় এই অ্যাক্সিডেন্ট কমানোর জন্য, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি জায়গাটা যেখানে দাঁড়িয়েছে তাতে অ্যাক্সিডেন্ট কমবার আশা দেখেতে পাচ্ছি না। যেটা ইমিডিয়েটলি খুব দরকার।

ডেইলি প্যাসেঞ্জার @ কলকাতা

আমরা এতটা অমানবিক?

নীল সরকার

সকাল মানেই আমাদের কাছে ট্রেন ধরবার তাড়া, সাইকেল গ্যারেজ, কখনও কখনও মান্থলি রিনিউ হাজার রকম সমস্যা। আর সপ্তাহের ছ'দিন এই সমস্যাগুলো সাইক্লিক অর্ডারে চলতেই থাকে। সাধারণত আটটা পঞ্চাশের গ্যালোপিং ট্রেনটাই ধরি। তবে সেদিন মেয়ের পরীক্ষা ছিল তাই এটা-সেটা গুছিয়ে দিয়ে বেরোতে বেশ খানিকটা লেট হয়ে গেছিল। অপরিচিত নৈহাটি লোকালটা ছুটে ছুটে ধরে কোনওক্রমে একটা সাইডে একটু অ্যাডজাস্ট হলাম। আসলে নিজেদের চেনা কম্পার্টমেন্ট, চেনা লোকজন না দেখতে পেলে একটু আনইজি লাগে বইকি।

এই ট্রেনটায় আমাদের ট্রেনের চেয়েও অনেক বেশি ভিড় হয়। কেউ কেউ মজা করে বলে ভুল করে যদি মাছি ঢুকে যায়, সেও গলতে পারবে না। তবে হকাররা কিন্তু এদিক-ওদিক গলে যায়। মালপত্রও বিক্রি করে কমফর্টেবলি। এই ট্রেনের লোকজন আমার অপরিচিত, হকারদের কাউকেই চিনি না বললেই চলে। ট্রেন নিজের মতোই পিকআপ নিচ্ছে। শ্যামনগর হয়ে ইছাপুর ছেড়ে ট্রেন পলতা ঢুকছে। হঠাৎই কম্পার্টমেন্টের ভেতর একটা শোরগোল শুরু হল, বুঝতে পারলাম কাউকে গণপ্রহার দেওয়া হচ্ছে। কৌতূহলে সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখেতে চাইছে সেদিকে কী হয়েছে। আমিও একটু উঁচু হয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম। কানে আসছে অকথ্য গালিগালাজ। একজন বলে উঠল, 'এখন হকারদেরও বিশ্বাস নেই, লোকটার চোদ্দো হাজার টাকার মোবাইলটাই ঝেড়ে দিল!' আমি একটু ভিড় ঠেলেই এগিয়ে গেলাম গিয়ে দেখালাম যাকে প্রহার করা হচ্ছে, একটা ইয়ং ছেলে বয়স খুব বেশি হলে কুড়ি-বাইশ হবে। যে যার মতো পারছে গালিগালাজ করছে সাথে চড়-থাপ্পড় তো চলছেই। বুঝতে পারলাম না কার মোবাইলটা চুরি হয়েছে। তবে এটা আমাদের সমাজে বেশ ঐতিহাসিক ঘটনাই বলা যেতে পারে যে, কী কারণে মারা হচ্ছে কাকে মারা হচ্ছে না জেনেই

হাতের সুখ মেটাতে মানুষ ওস্তাদ। ছেলেটির মুখ দেখে বড় মায়া হচ্ছিল। কেমন গোবেচারা দেখতে। নাক ফেটে রক্ত পড়ছে। একজনের উচ্চবাচ্যতে মনে হল তার ফোনটাই খোয়া গেছে। কিন্তু না, পরক্ষণেই ভুল ভাঙল তাঁর কথাতেই, 'একে কি রানিং ট্রেন থেকে ফেলে দেব? তোমার মোবাইল গেছে তুমি যা শাস্তি দেবে, তাই হবে বলো।' আমি শুধু এটা ভেবে অবাক হচ্ছিলাম ও যদি চুরি করে তবে মোবাইলটা গেল কোথায়?

ট্রেন দমদম ঢুকছে। আর দমদম ঢুকলে ছেলেটিকে জিআরপিতে তুলে দেবে এমনটাই ঠিকঠাক। যে যার ব্যাগ নামাচ্ছে বাংকার থেকে। হঠাৎ যার মোবাইল হারিয়েছে সে দেখল, সাইলেন্ট করা মোবাইলটা সিটের নীচে পড়ে আছে।

সারাদিন ভেবেছি আমরা এতটা অমানবিক? কেউ কিছু করেছে কিনা, না জেনে না বুঝেই...

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১২ জুন ২০১৭

রাস্তা @ কলকাতা

হ্যারিসন রোড থেকে মহাত্মা গান্ধী রোড

হৃদয় মালাকার

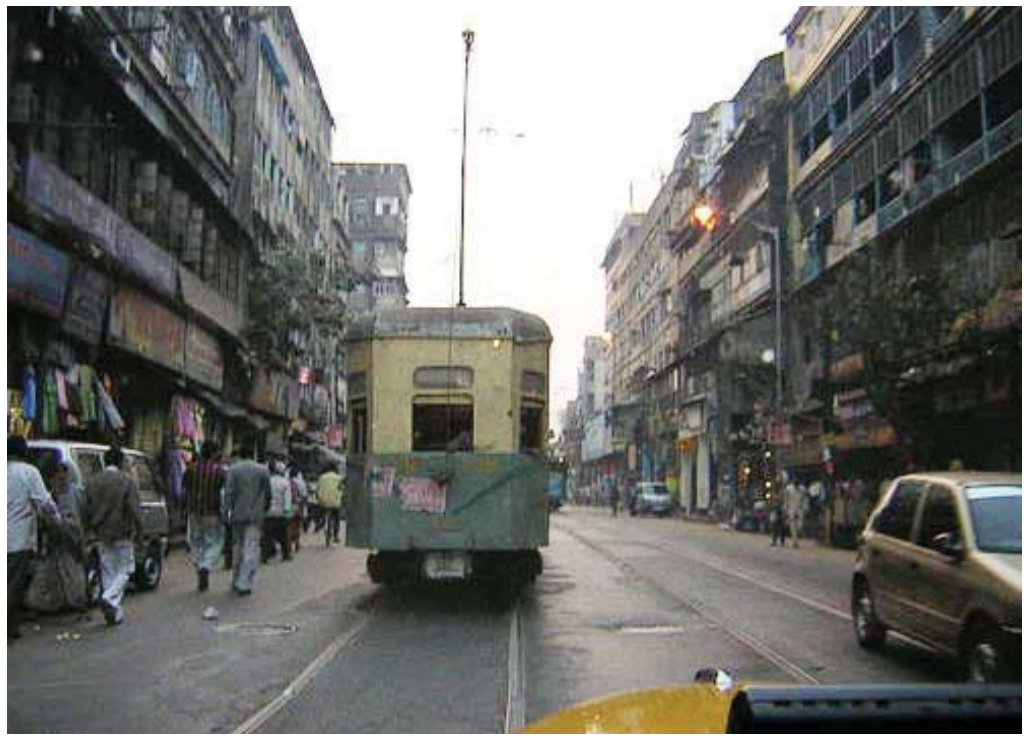

কলকাতা শহরে শিরা-উপশিরার মতো ছড়িয়ে আছে অসংখ্য রাস্তা। প্রত্যেকটা রাস্তার একটা ইতিহাস আছে, আছে ফেলে আসা সময়ের জানা-অজানা অনেক গল্প। কলকাতার উল্লেখযোগ্য রাস্তাগুলির মধ্যে 'মহাত্মা গান্ধী রোড ' অন্যতম। আমরা যাকে 'এমজি রোড ' বলে চিনি। কী ছিল তার আদি পরিচয়? কীভাবে তৈরি হল এই রাস্তা, কেমন ছিল সেই সময়ের কলকাতা? জানতে গেলে চোখ রাখতে হবে ইতিহাসের ক্যালাইডোস্কোপে।

হাওড়া ব্রিজ থেকে শুরু করে শিয়ালদহ পর্যন্ত দীর্ঘ এই রোডের আদি নাম ছিল 'হ্যারিসন রোড'। হেনরি হ্যারিসন ছিলেন তৎকালীন কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান। তাঁর নামেই এই রোডের নামকরণ করা হয়েছিল। তারপর...? তারপর ১৯৫৬ সালের ৫ জানুয়ারি কলকাতা পুরসভা এই রাস্তার নাম প্রস্তাব করে 'মহাত্মা গান্ধী রোড'। অনুমোদিত হয় ১৯৫৬ সালের ৩১ আগস্ট পুরসভার সাপ্তাহিক সভায়। তারপর থেকে ৮৯০০ ফুট দীর্ঘ এই রোডের নতুন অধ্যায় শুরু হল।

মহাত্মা গান্ধী রোড তৈরি করতে প্রায় তিন বছর লেগেছিল— ১৮৮৯ থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত। 'হ্যারিসন রোড'(মহাত্মা গান্ধী রোড) কলকাতার অনেক ঐতিহ্যবাহী একটি রাস্তা। চৌরঙ্গির শান্ত ভাব এখানে পাওয়া যায় না, কিন্তু এখানে যেসব প্রাসাদতুল্য বহুতল বাড়ি আছে, তাদের কাছে চৌরঙ্গি এখন প্রাসাদ সম্পদে পরাজিত। এই 'মহাত্মা গান্ধী রোড'। লক্ষ্মীর আবাসস্থল, ইংরেজ বাণিজ্যের সৌভাগ্যনিকেতন ছিল।

কোনওকালেই এই রাস্তার শান্তরূপ দেখা যায়নি। হাওড়া ব্রিজের নীচ থেকে শিয়ালদহের দিকে এগোতে থাকলে খুব সহজে হন হন করে হেঁটে যাওয়া সব সময়ই সম্ভব হয় না। ঠেলা, মুটে, ছোট ট্রলি, ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেট গাড়ির ভিড়ে অনবরত জ্যাম লেগেই থাকে। ফলে ভিড় ঠেলে এগোনো খুব কঠিন। সাধারণ যাত্রী কিংবা নিত্য পথযাত্রীর এসব গা-সওয়া হয়ে গেছে। কখনও কখনও সময়ের মূল্য ও অত্যাধুনিকতার মূল্য দিতে গিয়ে 'মহাত্মা গান্ধী রোড'-কেও রক্তস্নাত হতে হয়। তারপর রিপোর্টার, ব্রেকিং নিউজ, পুলিশ ইত্যাদি ইত্যাদি। এই পথের দুপাশে রয়েছে বড় বড় কুঠি এবং কাটরা। তার মধ্যে অপরিকল্পিতভাবে রয়েছে অগণিত দোকানপাট। বেশিরভাগই পোশাক-পরিচ্ছদের পসরা সাজিয়ে বসে রয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র পাল ও গঙ্গাপ্রসাদ পাল এখানকার অন্যতম প্রতিষ্ঠান। বড়বাজার অঞ্চলে এঁরা ব্যবসা শুরু করেন পঞ্চাশের দশকে। এই দোকানটির পূর্বতন মালিক ছিল ইস্টবেঙ্গল সোসাইটি। বেশ কিছু ব্যাংকও রয়েছে এই রাস্তার ওপর। এর মধ্যে রয়েছে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, এলাহাবাদ ব্যাংক, দেনা ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, ব্যাংক অব বরোদা, ব্যাংক অব ইন্ডিয়া। দাতব্য চিকিৎসালয় রয়েছে সামবেদো গোপিরাম ভেটিকা, রয়েছে বাবুলাল ধর্মশালা, হিন্দি বইয়ের দোকানও। মহাত্মা গান্ধী রোডেই আছে শিখদের ধর্মস্থান— গুরুদোয়ারা বড়া শিখ সংগত।

ব্যস্ততম এই রাস্তার প্রতিটি ধূলিকণায় জড়িয়ে আছে প্রতিদিনের পথচলার কত না গল্প, কত না কাহিনি। এভাবেই হয়তো এই রাস্তা সাক্ষী থাকবে আরও কত ইতিহাসের... আগামীর আরও কত ঘটনার...

পুরনো বাড়ি @ কলকাতা

জাতীয় জাগরণের প্রতীক মহাজাতি সদন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সে এক যুগসন্ধিক্ষণ বইকি, নাহলে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ভাবনা এবং প্রস্তাবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সানন্দে সায় দেবেন কেন। আসলে রবীন্দ্রনাথের কাছে সুভাষচন্দ্র ছিলেন দেশনায়ক। ভারতের মুক্তি সাধনায় বাঙালি যেন তার সদর্থক ভূমিকা রাখতে পারে, রবীন্দ্রনাথের এই অভিপ্রায়কে পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্রই তো বাস্তবায়িত করেছিলেন। তার জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে হয়েছিল তাঁকে। এমনকী তাঁর প্রিয় স্বদেশও। শেষ পর্যন্ত তিনি এক সীমাহীন রহস্য হয়েই থেকে গেছেন।

তখন তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন চলছে। নেতাজির স্বপ্ন ছিল এমন একটা কিছু প্রতিষ্ঠা করা যেখানে জাতি-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে শুধুমাত্র ভারতীয় হিসাবেই সকলে এসে সমবেত হতে পারবে। এমন একটা প্রেক্ষাগৃহ স্থাপন, যেটি সভা ডাকার উপযুক্ত হতে পারে। এই ইচ্ছার কথা তিনি ১৯৩৭ সালের মে মাসে তাঁর স্থানীয় মানুষজনের কাছে প্রকাশ করেন। অনেক চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত জমি পাওয়া যায় যেটি চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর উপর অবস্থিত। সুভাষচন্দ্র পৌরসংস্থা থেকে ১ টাকা লিজে জমিটি নিয়ে নেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি তাঁর ইচ্ছের কথা জানিয়ে অনুরোধ করেন প্রস্তাবিত ভবনটির একটি নাম ঠিক করে দিতে এবং তার ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করতে। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হন। ১৯৩৯ সালের ১৯ আগস্ট রবীন্দ্রনাথই অন্য আরও বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে প্রস্তাবিত ভবনটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং তার নামকরণ করেন মহাজাতি সদন' (House of the Nation)।

সেই সময়কার ইংরেজ শাসন বিরোধী আন্দোলনে মহাজাতি সদন নির্মাণের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সভাসমিতি ডাকার সেরকম নির্দিষ্ট কোনও স্থান ছিল না যেখানে অনেকে সমবেত হতে পারে, ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সেদিক থেকে সুভাষচন্দ্রের এই স্বপ্নপূরণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু মাঝপথে কেমন যেন তাল কেটে গেল। সুভাষচন্দ্র তাঁর এলগিন রোডের বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হলেন, যে অন্তর্ধান রহস্যের আজও কোন সর্বজনগ্রাহ্য কিনারা হয়নি। তাঁর 'ফেরার' হয়ে যাওয়ায় তাঁর নামে জমির লিজ বাতিল করে দেওয়া হল। মহাজাতি সদন নির্মাণের কাজ থেমে থাকল। পরবর্তীকালে দেশ স্বাধীন হবার পর পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে আবার নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ১৯৫৮ সালে তার উদ্বোধন হয়।

মহাজাতি সদন ভবনটি চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ও মহাত্মা গান্ধী রোডের (আগেকার সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ও হ্যারিসন রোড) সংযোগস্থলের কাছে অবস্থিত। এর নকশা তৈরি করেছিলেন শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট স্থপতি সুরেন্দ্রনাথ কর। ৩৮ কাঠা জমির উপর নির্মিত মূল ভবনটি চারতলা। প্রেক্ষাগৃহটি যথেষ্ট বড়, ১৩০০ আসনবিশিষ্ট। প্রেক্ষাগৃহের চারপাশে কয়েকটি হলে স্থায়ী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা আছে। যেমন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে একটি স্থায়ী প্রদর্শনী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ দ্বারা স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেকগুলি সাদা-কালো আলোকচিত্রের একটি বিশেষ স্থায়ী প্রদর্শনী ইত্যাদি। সদনের মধ্যে ৫৫০ জন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীর তৈলচিত্র সযত্নে রক্ষিত আছে। তাছাড়াও রয়েছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন ও সংগ্রাম-বিষয়ক সাদা-কালো আলোকচিত্রের প্রদর্শনী। প্রধান হলটিতে প্রবেশের দু'ধারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর দুটি আবক্ষ মূর্তিও আছে। এখানে মহাজাতি সদন বিধানচন্দ্র গ্রন্থাগার নামে লাইব্রেরিটিতে প্রচুর বইপত্র ও পত্রপত্রিকা আছে। তার মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিপ্লবীদের জীবনী-বিষয়ক বইয়ের সংখ্যাও যথেষ্ট।

বর্তমানে সদনে বিখ্যাত জাদুকরের জাদু প্রদর্শনী হয়ে থাকে, সেমিনার হলে সেমিনারও অনুষ্ঠিত হয়। যদিও সেই গৌরবময় অধ্যায়কে অনেক পিছনে ফেলে এসেছে মহাজাতি সদন, তবু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এই ভবন নিছক কোনও দলীয় কাজকর্মের কার্যালয় বা মিলিত হবার জায়গা ছিল না, বরং বাংলার জাতীয় জাগরণের এক প্রতীক। সেখানে গেলেই যেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বীর শহিদদের আত্মবলিদানের ইতিহাসের অনেকটা স্পর্শ পাওয়া যায়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ও রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের মিলনক্ষেত্র হয়ে ওঠাতেই এর অস্তিত্ব সার্থক হয়েছে। সেদিক থেকে 'মহাজাতি সদন' শুধু একটি সাধারণ ভবন বা প্রেক্ষাগৃহ মাত্র তো নয়ই, বরং ঐতিহ্যপূর্ণ এই ভবনের গুরুত্ব ভীষণভাবেই ঐতিহাসিক।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১২ জুন ২০১৭

শহরে স্বর্গের বারান্দা

বীথি চট্টোপাধ্যায়
(লেখিকা)

সত্তরের দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখার কিছু অদ্ভুত লক্ষণ এই শহরকে বেশ কাবু করে রেখেছিল। তাঁর কাহিনিতে তিনি প্রায়ই এমন সব মেয়েদের চরিত্র তৈরি করতেন যে মেয়েরা দুনিয়াদারির কোনও মারপ্যাঁচ বিন্দুমাত্র জানে না। একেবারে প্রথম জীবন আর শেষজীবনের কয়েকটি গল্প-উপন্যাস বাদে কূটনীতিপরায়ণ, প্যাঁচালো মহিলা সুনীলের লেখায় কখনও আসেনি। কাহিনির প্রয়োজনে কোনও কূটনীতি জানা মহিলাচরিত্র তাঁর লেখায় এলেও গল্পের সেই মেয়েটিকে তিনি মন্দ মেয়ের মতো করে নামিয়েছেন। যে মেয়ে সকলের সব শয়তানি ধরে ফেলে সেই মেয়েকে সুনীল একপাশে সরিয়ে দিয়েছেন। অবোধ না হলে যেন মেয়েরা মানবিক হতে পারে না এটা বারবার সুনীল লিখেছেন এবং সেই লেখা নিয়ে ঝড় উঠেছে শহরের অন্দরমহলে। সুনীলের লেখায় মহিলারা সরলতার সমার্থক। তারা শিশুর মতো অবোধ। এতই সরল সেইসব মেয়েরা যে হঠাৎ করে তাদের দিকে চোখ পড়লে আমরা বিষম চমকে উঠব। ধরা যাক, ট্যাক্সি চেপে একটি মেয়ে কোথাও যাচ্ছে তার প্রেমিকের সঙ্গে। সদ্য বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে শহরে। মেয়েটির হাতে শৌখিন ব্যাগ। তার প্রেমিকের হাতে সিগারেট। বেশ মাখোমাখো একটা সিকোয়েন্স আসতে চলেছে উপন্যাসে। এমন সময় কাহিনিতে ট্যুইস্ট। হঠাৎ সেই ট্যাক্সির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারল একটা ম্যাটাডোর। ট্যাক্সিটা হেলে গেল। মেয়েটির ব্যাগ ছিটকে পড়ল। ছেলেটির মাথা ঠুকে গেল সামনের সিটে। তবে বড় দুর্ঘটনা ঘটল না ভাগ্যক্রমে।

যাইহোক ঘটনার আকস্মিকতার মধ্যে ট্যাক্সিচালক জানালা দিয়ে নিজের মুখ বার করে ম্যাটাডোরের উদ্দেশ্যে একটি অশ্রাব্য গালি দিলেন। ট্যাক্সির যাত্রী ছেলেটি মেয়েটি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণির। তাই গালি শুনে ছেলেটি একটু অপ্রস্তুত, বিরক্ত। ট্যাক্সিচালকের গালি শুনে ম্যাটাডোরও ফুঁসে উঠে উত্তর দিল। ম্যাটাডোরের ভাষা আরও অশালীন। ম্যাটাডোরের গালি শুনে ট্যাক্সি ফুঁসে উঠে ফের তুমুল যৌনতাসূচক অশ্রাব্য প্রতিগালি ছুঁড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আবার ম্যাটাডোর জবাব দিল— আরে তুই তোর.... এবার ট্যাক্সির যাত্রী ছেলেটি ফুঁসে উঠে বলল, 'কী হচ্ছে কী এটা? এসব মুখ খারাপ বন্ধ করুন। না হলে আমারা এখানেই নেমে যাচ্ছি আপনারা কম্পিটিশন করে যত খুশি গালাগালি দিন।' ছেলেটির কথায় ট্যাক্সিচালক কী ভাবলেন কে জানে। বিড়বিড় করে একটা গালি দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে সামনে চলতে শুরু করলেন। এইসময় ছেলেটির পাশ থেকে মেয়েটি অবাক মুখে জোরে জোরে জিজ্ঞেস করল 'ওমা ওরা এতক্ষণ যা বলছিল সেগুলো গালাগালি? খুব খারাপ কথা? তাই আমি ভাবছিলাম কেন আমি কথাগুলোর মানে বুঝতে পারছি না।' ছেলেটি মেয়েটিকে থামাতে গেল কিন্তু মেয়েটি শুনল না। সে এবার সোজাসুজি ট্যাক্সিওয়ালাকে বলল, 'আপনি কেন একজন মহিলার সামনে খারাপ কথা উচ্চারণ করলেন। আমি আর আপনার ট্যাক্সিতে যাব না। কিছুতেই যাব না।' এদিকে বেশ রাত হয়ে গিয়েছে। সেই ষাটের দশকে কলকাতায় রাতে ট্যাক্সি জোগাড় করা ছিল মহা ঝামেলার ব্যাপার। কিন্তু মেয়েটিকে কিছুতেই থামানো গেল না। সে চলন্ত ট্যাক্সির দরজা খুলে নেমে পড়তে গেল। ট্যাক্সিওয়ালা ফের বিড়বিড় করে কিছু বললেন। বলে চলন্ত গাড়ি থামিয়ে দিলেন ব্রেক চেপে। ছেলেটি ট্যাক্সিভাড়া দিয়ে মেয়েটির সঙ্গে মাঝরাস্তায় নেমে যেতে বাধ্য হল। গাড়ি থেকে রাস্তায় নেমে ছেলেটি একটু বিরক্ত। তার পাশে মেয়েটি অশ্রু ছলোছলো চোখে বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে রইল শহরের রাজপথে। ওরা ওভাবে আপাতত দাঁড়িয়ে থাকুক। আমরা ওদের সময়টাকে বরং একটু মনে করি।

সেটা ষাটের দশকের শেষ। নকশালবাড়ি আন্দোলন নিঃশ্বাস ফেলছে শহরে। আকাশকুসুম বুলি পড়িয়ে ছোট ছোট ছেলেদের মাথা খাচ্ছে কোনও নেপথ্য শক্তি। নকশালপন্থার পেছনে যে বিদেশি শক্তির মদত রয়েছে একথা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষকে বোঝাতে কার্যত ব্যর্থ কংগ্রেস সরকার। নকশালপন্থীরা সাধারণ মানুষের প্রভূত সমবেদনা পাচ্ছেন। এবং সেই সমবেদনা নকশালরা পাচ্ছেন সেই সময়ের রাজ্য সরকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, কালোবাজারি, দারিদ্র্য, আইনশৃঙ্খলার অবনতির কারণে। মানুষ ভাবছেন নকশাল আন্দোলন বুঝি একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত। নকশালরা বুঝি সব বদলে দেশ থেকে অন্যায়-বৈষম্য সব ঘুচিয়ে দেবে। একদিকে অশান্ত রক্তাক্ত বিদেশি মদতপুষ্ট রাজনীতি। অন্যদিকে শোষণ, অবিচার, দুর্নীতি। মধ্যবিত্তর অবস্থা নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর মতো। আর গরিবদের হাড়-পাঁজরা গোনা যাবে এমন চেহারা। তখন কলকাতায় যাঁরা সচ্ছল তাঁদেরও হাতের কাছে এত বিনোদন তো আর ছিল না। শপিং মল ছিল না, গাড়িতে-বাড়িতে এত এয়ারকন্ডিশন ছিল না, স্মার্টফোন ছিল না, সিনেমাহলে পাখার নীচে সিট পাওয়া ছিল সৌভাগ্যের ব্যাপার। বুদ্ধিজীবীরা বেশিরভাগ নাম লিখিয়েছেন বাম রাজনীতির শিবিরে। চারিদিকে নৈরাজ্য। এইসময় বাঙালিকে কঠোর বাস্তব ভুলিয়ে দেবার একটা মজার খেলা শুরু করলেন সুনীল, বুদ্ধদেব, সমরেশ। বাস্তবের ওপরে যাওয়ার এই দৌড়ে আবার সবচেয়ে এগিয়ে ছিলেন সুনীল। ফলে দেখা গেল সত্তরের দশকের শুরু থেকে কলকাতায় সুনীলের বই কেনার হিড়িক পড়ে গিয়েছে। 'বসন্তদিনের ডাক', 'সতেরো বছর বয়েস', 'ছবিঘরে অন্ধকার', 'সন্ধ্যার মেঘমালা' এইসব উপন্যাসে ছেয়ে দিল কলকাতার মধ্যবিত্ত বা ঈষৎ উচ্চবিত্ত মন মেজাজ। হু হু করে বিক্রি হতে লাগল বই। বইয়ের পাতা থেকে নেমে কলকাতা শহরে হাঁটতে শুরু করল সুনীলের অলীক চরিত্রের মেয়েরা। যেসব মেয়েদের পা মাটি ছোঁয় না। তারা অনেক বই পড়ে তবু তারা শিশুর চেয়ে অবোধ। আর ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির মিথ্যে বলতে পারেন কিন্তু সেইসব মেয়েরা কোনও মতেই মিথ্যে কথা বলে না, কেউ অসৎ উদ্দেশ্যে স্পর্শ করলে যেসব মেয়েরা বুঝতে পারে না। রাস্তাঘাটে কেউ চোখ মারলে যেসব মেয়েরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। অর্থাৎ সুনীল স্পষ্ট লিখেছেন একটি মানসিকভাবে সুস্থ যুবতী মেয়ে চোখ মারবার অর্থ বুঝল না। প্রায়ই সুনীলের লেখায় এমন একটা লাইন থাকত 'দুনিয়ায় যে খারাপ মানুষও আছে এই মেয়েটি সেকথা জানে না।' এইসব লেখা মফসসলের থেকেও ছাপ ফেলেছিল কলকাতার মধ্যবিত্ত মানসে। কারণ সুনীলের কাহিনির চরিত্ররা বেশিরভাগ ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। তাদের পোশাক-আশাক, হাবভাব, রুচি সবই কলকাতাঘেঁষা।

এইসব মেয়েদের কথা পড়তে পড়তে আমদের বয়েস বাড়তে লাগল। এমনভাবে সুনীল গল্পটা বলতেন পৃথিবী থেকে সেটা আমাদের একটু উঁচুতে নিয়ে যেত।

নকশাল আন্দোলন শেষ হবার পরে তখন শহরে মাথাচাড়া দিয়েছে একটা ভয়ানক গুণ্ডারাজ। তোলাবাজি। জুলুম। প্রথম শহরে ঢুকতে চাইছে কম্পিউটার। বাম নেতা কর্মী সংগঠনগুলি একযোগে বিরোধিতা করছেন কম্পিউটারের। শহরের অফিসে কম্পিউটার আনা যাবে না কারণ তাতে অনেক কর্মীর ছাঁটাই হবার আশঙ্কা দেখছেন বামেরা। কিন্তু পৃথিবীতে তো সাইবার যুগের সূচনা হয়ে গিয়েছে। কলকাতায় কিন্তু সমবেত আন্দোলনে কম্পিউটার ঢুকতে পারল না। শহরে তখন চলে খটাখট টাইপরাইটার। প্রায় রোজ মস্তানির আগুনে জ্বলে ওঠে শহরের অলি-গলি, স্টোনম্যান বলে এক আশ্চর্য সিরিয়াল কিলার রাতের শহরে ঘোরে আর ফুটপাতের লোকজনকে পাথরে পিষে মারে। মেয়েটির মতো মেয়েকে যুবকরা খুঁজছে তাদের বান্ধবীর ভিতর। যুবতী মেয়েরা বাস কন্ডাক্টারের মুখের ভাষা বুঝতে না পেরে হেসে উঠছে অনাবিল। সুনীলের বই কিনতে লাইন পড়ছে দোকানে। শহরে যেখানে সুনীল বসছেন তাঁকে কলহাস্যে ঘিরে ধরছে মেয়েরা। সুনীলের সিগনেচার ছেয়ে যাচ্ছে শহুরে মানসে। সত্তর হয়ে আশি তারপর নব্বই দু'হাজার সাল সুনীল তাঁর মুঠোয় ভরে রাখলেন শহরের মধ্যবিত্ত বিনোদন। তারপর আস্তে আস্তে সময়টা বদলে গেল। মেয়েরা শহরে সবরকম কাজের দৌড়ে নেমে পড়ল হু হু করে। গালাগালি না জানা দূরের কথা, মেয়েরা কাঁচা গালি দিতে শুরু করলেন অবিরত তাঁদের দৌড়-ঝাঁপের জীবনে। মানুষের হাতে এসে গেল কম্পিউটার, মোবাইল ফোন এবং প্রচুর তথ্য। সুনীলের নায়িকারা একটু একটু করে হারিয়ে যেতে লাগল শহর থেকে। এই শহর আর বিশ্বাস করতে পারল না সুনীলের চরিত্রদের। বিশেষত মেয়ে চরিত্রদের। শহরটা অনেক পরিণত, অনেক বয়স্ক হয়ে গেল দেখতে দেখতে। স্মার্টফোন, গুগল, মাল্টিপ্লেক্স এসে ঘরে ঢুকে পড়ল। এই অবস্থা বাস্তব-অবাস্তবের মাঝখানে যে ঝুলন্ত বারান্দা সুনীল শহরে এঁকেছিলেন সেটা ক্রমশ আবছা হয়ে

সেই পাথর মানুষ যে কে ছিল তা তখনকার অতি সক্রিয় পুলিশবাহিনী কোনও অজ্ঞাত কারণে খুঁজে পেল না। তখন দূরদর্শনে দিনে একবার বাংলা খবর পড়া হতো আধ ঘণ্টার জন্যে। শহরে একটা আত্মহত্যার ঘটনা ঘটলে খবরের কাগজে আলোচনা হতো দশ-বিশ দিন ধরে। এইরকম একটা সময় মানুষ যখন সময়টাকে বুঝতে পারছেন না। তখন সুনীল লিখে যাচ্ছেন... কলকাতার রাসবিহারী ধরে হাঁটছে একটি মেয়ে... তার পায়ের চটি শাদা, সিল্কের শাড়িও সাদা, চোখে অবাক অবাক দৃষ্টি। সেই মেয়ে কোনওদিন গালাগালি শোনেনি, মিথ্যে কথা বলেনি, পৃথিবীতে খারাপ কিছু আছে বলে সে জানে না... মেয়েটি রাসবিহারী এভিনিউ ধরে হাঁটছে তার পিছনে শহরের মধ্যবিত্ত বিনোদন। ওই যেতে শুরু করল একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে। এই শহরে ধীরে ধীরে নতুন নতুন অনেক কিছু এসে পড়ল। ভালো-মন্দ ছোট-বড় কত কী। শহর নতুন কত কিছু জানল শিখল। শহরের সব মেয়েরা মাটিতে পা দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। আস্তে আস্তে কলতাতা শহর হেসে উড়িয়ে দিল সুনীলের সেই চরিত্রদের যাদের পা শহরের মাটি ছুঁতো না। তারপর শহরের ধুলো যাদের গায়ে লাগত না সেই মেয়েরা সুনীলের সঙ্গে শহর থেকে বিদায় নিল একদিন। এখন শহর অনেক ঝরঝরে, যুক্তি নির্ভর। বাস্তব। আর কোনও ম্যাজিক এ শহরে সহজে ঘটে না। যাঁদের পা শহরের মাটিতে পড়ে না তাঁরা এই শহর থেকে একেবারেই হারিয়ে গিয়েছে। আর তাঁরা কোনওদিন ফিরবে না এখানে।

যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১২ জুন ২০১৭

বলিউডে বাঙালি খরা কি সত্যিই কাটল?

স্বর্ণালী পাল

সাদাকালো থেকে রঙিন প্রজন্ম, বিনোদনের তালিকায় প্রথমেই থাকে ‘সিনেমা’। সিনেমা রাজ্যের, রাষ্ট্রের গণ্ডি পেরিয়ে ভাষার সীমানা ভেঙে মানুষের কাছে পৌঁছয়। যে কোনও বয়সের মানুষের কাছে সিনেমার মাধ্যমেই সবচেয়ে সহজভাবে বার্তা বা বিনোদন পৌঁছে যায়। বর্তমানে ভারতে বছরে সবথেকে বেশি সিনেমা তৈরি হয় তামিল ও তেলুগু ভাষায় তারপর হিন্দি এবং বাংলায়। মুম্বই (বোম্বে) হিন্দি সিনেমার শহর হলেও একটা সময় ছিল যখন ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে শুরু করে গায়ক গায়িকা, পরিচালক, টেকনিশিয়ানদের মধ্যে এক বৃহদংশই ছিলেন বাংলাভাষী বা বলা ভালো কলকাতাবাসী। হিন্দি সিনেমার কৈশোর পার হয়েছে কলকাতার শিল্পীদের হাত ধরেই। মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে উৎপল দত্ত, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় থেকে ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও গায়কদের মধ্যে ছিলেন এস ডি বর্মন, আর ডি বর্মন, মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, গীতা দত্ত, কুমার শানু প্রমুখ। পরবর্তী সময়ে শান, শ্রেয়া ঘোষাল, বাপ্পি লাহিড়ী, অরিজিৎ সিং, অভিজিৎ, বাবুল সুপ্রিয় এমন অনেক নামই করা যায়। এঁদের প্রত্যেকেরই বাংলায় জন্ম এবং বড় হওয়া। বাংলা ও হিন্দি ভাষার সিনেমাতে সমান দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন এঁরা। কলকাতার কলাকুশলীরা শুধুমাত্র বাংলা, হিন্দি নয় আরও অনেক ভাষার চলচ্চিত্রে কাজ করতেন। বলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বিশ্বের অন্যতম প্রধান বড় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি। স্বভাবতই সেখানে অনেক ভাষাভাষীর মানুষ কাজ করেন। প্রশ্ন হল কলকাতার বড় অংশের কাজের দ্বারাই কি বলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল নাকি এই ইন্ডাস্ট্রির জন্যই শিল্পীদের শিল্পসত্তা বিকশিত হয়েছিল? এ প্রশ্নের থেকেও বড় যে বিষয় তা হল বলিউডে বাঙালির ওঠাপড়া। বর্মন, মান্না দে, কিশোরকুমারদের দিয়ে বাঙালির যে বলিউড অভিযান শুরু হয়েছিল তা মাঝপথে কেন ভাটার কবলে পড়ল? আবার শান, শ্রেয়া, রাহুল বসু, অভিজিৎ, অনুরাগ বসু বা সৃজিতদের হাত ধরে তা ফিরে এলেও তা কি সেই জনপ্রিয়তায় পৌছতে পারল?

গায়ক মান্না দে প্রথম বলিউডে গান করেন ফ্যানি মজুমদারের একটি সামাজিক হিন্দি সিনেমা ‘তামান্না’ (১৯৪২)-তে। তারপর বিজয় ভাটের পরিচালনায় ‘রাম-রাজ্য’ (১৯৪৩) থেকে শুরু হয়ে একে একে হিন্দি সিনেমায় গান করতে থাকা। ‘রাম-রাজ্য’ সিনেমাতেই একমাত্র মহাত্মা গান্ধীর জীবনকাল দেখা গেছে। এই সিনেমাতে গানকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সিনেমা দুটি সেই সময় যথেষ্ট সফলতা অর্জন করে। ষাটের দশকের সাড়াজাগানো সিনেমা ‘ছোটে নবাব’ (১৯৬১) যা সামাজিক বার্তা দিয়ে তৈরি হয়েছিল অন্যদিকে ‘পেয়ার কা মৌসম’-এর মতো হিন্দি ড্রামা মুভিও তৈরি হয়েছিল অর্থাৎ বিভিন্ন স্বাদের সিনেমার জন্য ভিন্ন ধরনের গানের মধ্যে দিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন আর ডি বর্মন। সেই সময় বলিউড ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। একের পর এক হিট ছবি তৈরি হয়েছে। আর ডি বর্মন অসংখ্য হিন্দি ছবিতে গান গেয়েছেন এবং সংগীত পরিচালনা করেছেন যেমন ‘পতি পত্নী’, ‘অভিলাসা’, ‘ওয়ারিশ’, ‘কাটি পতঙ্গ’ প্রভৃতি। তাঁর হিন্দি গানের সফর আজও মানুষের মনে সচল রয়েছে।

সত্তরের দশকে বলিউডে এসেছিলেন চলচ্চিত্র জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্ররা যেমন—উত্তমকুমার, উৎপল দত্ত, জয়া ভাদুড়ি ও মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়ের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। তৈরি হয়েছিল বিখ্যাত ছবি ‘গুড্ডি’ যার কাহিনি এখনও সজীব দর্শকের মনে। মহানায়ক উত্তমকুমার বাংলা ছবির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি ছবিও দর্শককে উপহার দিয়ে গেছেন। সিনেমার জনপ্রিয়তার কারণেই ‘অমানুষ’, ‘আনন্দ আশ্রম’ বাংলা ও হিন্দি দুই ভাষাতেই মুক্তি পেয়েছিল। অভিনেত্রী মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়কে শক্তি সামন্তর পরিচালনায় প্রথম হিন্দি ছবি ‘অনুরাগ’ সিনেমায় নায়িকার ভূমিকায় দেখা যায়। সেই বছর চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কার পান তিনি। উৎপল দত্ত ‘গোলমাল’-এর মতো হাসির সিনেমাতে যেমন অভিনয় করে পরিচিতি পেয়েছিলেন ঠিক তেমনই তার সঙ্গে ভারতীয় চলচ্চিত্রে ইতিহাসে হিন্দি সমান্তরাল চলচ্চিত্রেও নিজের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ‘ভুবন সোম’ বলিউডের প্রচলিত রোমান্টিক ধারাকে ভেঙে বাস্তব জীবনের কাহিনি তুলে ধরেছিল। এছাড়াও ‘সফর’, ‘অভিমান’, ‘কিতাব’, ‘ছোটি সি মুলাকাত’-এর মতো কালজয়ী সিনেমা যার প্রায় প্রতিটি জাতীয় স্তরে পরিচয়প্রাপ্ত। সিনেমাগুলির কেন্দ্রীয় চরিত্রে দেখা গেছে কলকাতাবাসীদের। তাই বলাই বাহুল্য যে তাদের হাত ধরেই বলিউডে এসেছে স্বর্ণযুগ।

তার কিছুদিন পর অভিনেতা ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় ও গায়ক কুমার শানু মুম্বইতে পা দেন একই সঙ্গে বাংলা ও হিন্দি সিনেমায় কাজ করতেন তাঁরা। বলিউড সিনেমার জয়রথ এগিয়ে নিয়ে চলেছে এঁরাই তখন ‘কলিযুগ’, ‘আরোহণ’, ‘দুসরি দুলহান’(১৯৮৩) তৈরি হয়। ‘দুসরি দুলহান’ ছিল একটি ড্রামা ফিল্ম নায়ক ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুরের অভিনয় প্রসংশনীয়। কুমার শানু হিন্দিতে কাজ করা শুরু করেন ‘জাদুগর’ সিনেমা থেকে। তারপর ‘আশিকি’। এই ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ মেল প্লে ব্যাক সিঙ্গার ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড পান। অন্যদিকে উৎপল দত্তের ‘আপ কে সাথ’ তনুজা অভিনীত ‘মৌসম’ - যে সব সিনেমা বক্সঅফিসের সাফল্য পায়নি আশির দশকে। তারপর ক্রমশ বলিউড থেকে বিদায় নিতে থাকে কলকাতাবাসী। মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় অভিনীত ‘ঘায়েল’ ছিল একটি অ্যাকশন ড্রামা ফিল্ম যা সে সময় ১৯ কোটি টাকার ব্যবসা করে। সম্ভবত উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ অ্যাকশন ফিল্ম ছিল এটি। ১৯৯০-এর পর থেকে টলিউড পাড়ার নামকরা কাউকেই আর মুম্বইয়ে সেভাবে দেখা যেত না। বলিউড সিনেমা মুম্বইকেন্দ্রিক হয়ে না পড়লেও কলকাতার শিল্পীদের শূন্যস্থানটা ছিল চোখে পড়ার মতো। পরবর্তী সময়ে তৈরি হতে থাকল ‘বাগি’, ‘কুরবান’, ‘লাভ’, ‘সাজন’-এর মতো সিনেমা। সাফল্য পেলেও হিন্দি চলচ্চিত্রের চেহারার পরিবর্তন হয়। উল্লেখিত ঋষি কাপুরের প্রথম ছবি ‘মেরা নাম জোকার’ এর মতো সিনেমাও সেই সময় সাফল্য পায়নি, পরে যদিও ক্লাসিক সিনেমার খ্যাতি পায়। কলকাতার শিল্পীরা বলিউড থেকে অবসর নেওয়ায় ও নতুন কেউ না আসায় বা সুযোগ না পাওয়ায় চলচ্চিত্র জগতে একপ্রকার শূন্যতার সৃষ্টি হয়। উত্তমকুমার, মান্না দে, আর ডি বর্মন মারা গেলেন, অনেকে বার্ধক্যের কারণে চলচ্চিত্র জগৎ থেকে বিদায় নিলেন। বলিউডে কলকাতার শিল্পীদের অনুপস্থিতি কি সেই সময় বাণিজ্যিকভাবে হিন্দি সিনেমার অবক্ষয়ের কারণ? সে প্রশ্নের অবশ্য কোনও নির্দিষ্ট উত্তর পাওয়া যায় না।

তবে কালের ধারায় মরা নদীতে জোয়ার এসেছে। বর্তমানে গতানুগতিক সিনেমার বাইরেও বিকল্পধারার ছবি হচ্ছে, গবেষণামূলক ছবি হচ্ছে। এখন কলকাতার অভিনেত্রী, গায়ক ছাড়াও পরিচালকরা প্রধানত হিন্দি সিনেমায় কাজ করছেন। যেমন রাইমা সেন একদিকে ‘চোখের বালি’ অন্যদিকে ‘পরিণীতা’ দুটিতেই সমান সাফল্যের অধিকারিণী। কঙ্কণা সেন শর্মা সিনেমা পরিচালনা এবং অভিনয় দুই করেন। বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি তিন ভাষার ছবিতেই কাজ করেন। ‘ওমকারা’ শেক্সপিয়ারের গল্প নির্ভর সিনেমা যেখানে কঙ্কণা সহ অভিনেত্রী হিসাবে কাজ করে। ‘ওমকারা’য় অভিনয়ের জন্য চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ সহঅভিনেত্রীর পুরস্কারও পান তিনি। সমসাময়িক সমান্তরাল ছবির অভিনেত্রী হিসাবেই বেশি সাফল্য পেয়েছেন।

গান সিনেমার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তাই সঠিক গায়ক নির্বাচন করাও কঠিন। ‘তেরে লিয়ে’, ‘ ইয়ার কি সাদি হ্যায়’, ‘ধুম’, ‘ধুম-২’ ছাড়াও প্রভৃতি সিনেমার বক্স অফিসের অঙ্ক বৃদ্ধির পিছনে তাঁর পরিচিত কণ্ঠের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি কলকাতা শহরেই প্রথম গানের চর্চা শুরু করেছিলেন, কিন্তু কর্মজীবন শুরু করেন বলিউডের হাত ধরে। প্রীতম চক্রবর্তী শুধু গায়ক নন সংগীত পরিচালকও। অ্যাডভেঞ্চার থেকে থ্রিলার একে একে ‘আলাদিন’ ‘কাহানি’ ‘কাহানি ২’(২০১৬), যেমন পরিচালনা করেছেন, তেমনই আবার ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘সত্যান্বেষী’-তে অভিনয় এবং রিভু দাশগুপ্তর ‘তিন’ সিনেমাটি প্রযোজনা করেন সুজয় ঘোষ। ‘পিকু’, ‘ম্যাড্রাস ক্যাফে’, ‘ভিকি ডোনার’, ‘ইয়াহান’ সিনেমার নাম বলতেই যার নাম দিয়ে শুরু করতে হয় তিনি হলেন পরিচালক সুজিত সরকার। সুজয় ঘোষ, সুজিত সরকারের মতো পরিচালক ও প্রযোজকরা একই সঙ্গে বলিউড ও টলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে প্রাণবন্ত করে রেখেছেন। বাংলা ও হিন্দি দুই ভাষার সিনেমাতেই কাজ করেন এমন শিল্পীর সংখ্যা অগণিত এবং তাঁদের কাজের ক্ষেত্রও বিস্তৃত। বর্তমানে আলাদা করে টলিউডের বা বলিউডের শিল্পী বলে পৃথক করাই কঠিন কারণ, শুধু অভিনেতা-অভিনেত্রী নয় বা গায়ক-গায়িকা নয় ফ্যাশন ডিজাইনার থেকে সেট ডিজাইনার, ড্যান্স কোরিওগ্রাফার থেকে লাইটম্যান কেউই এখন নির্দিষ্ট একটা ভাষায় কাজ করেন না। এর ফলে চলচ্চিত্র জগতে বৃত্তের সীমানা বেড়েছে ও সামগ্রিক পরিবর্তন হয়েছে। সেই কারণেই শুধু বলিউড নয়, টলিউডও এখন উন্নতির সোপানে পা রেখেছে। আর বলিউডে কলকাতাবাসী বাঙালির অভাব দূর করে গায়ক, গায়িকা, পরিচালক, বা অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যে সুনাম ফিরিয়ে এনেছেন তা নিসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১২ জুন ২০১৭

কলকাতার মুদ্রণজগৎ ও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য

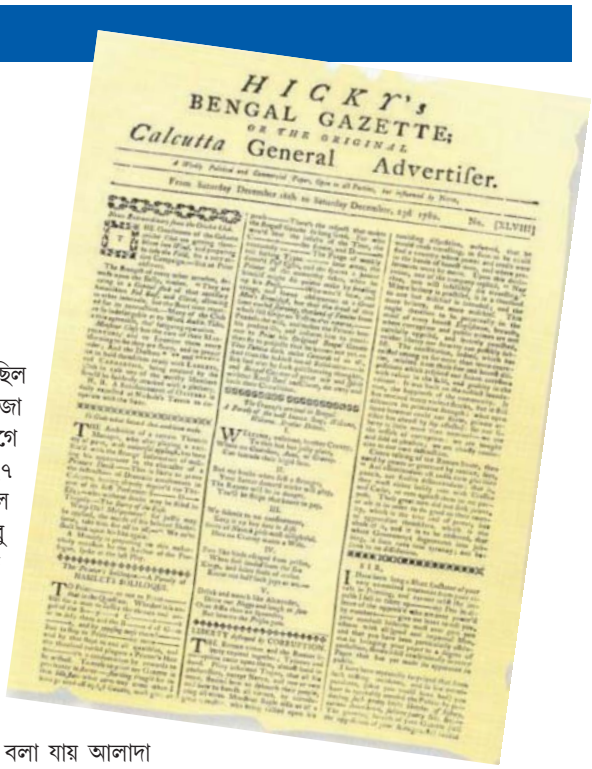
HICKY's
BENGAL GAZETTE;
OR THE ORIGINAL
Calcutta General Advertiser.

দোয়েল দত্ত

সকালে চায়ের আড্ডায়, কফি হাউসের বিতর্কের বিতণ্ডায় কিংবা সেনসেশনাল খবরের দুনিয়ায় যে-বস্তুটি ছাড়া আমরা আজও প্রায় পঙ্গু তা হল সংবাদপত্র। 'প্রায়' কথাটা বাধ্য হয়েই জুড়তে হল। চারিদিকে ফেসবুক আর হোয়াটস অ্যাপ এসে এখানে যে পরিমাণ দখলদারি বসিয়েছে যে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে সংবাদপত্র বস্তুটির অস্তিত্ব কেমন হবে... যাক সে বিতর্ক আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় নয়।

এখনও সকালে গ্রিন টি, হার্বাল টি-তে অভ্যস্ত বাঙালির দিন শুরু করার প্রথম উপকরণই হচ্ছে সংবাদপত্রের প্রথম পাতার রাজনীতির কড়চা। যতই সকালে উঠে হোয়াটস অ্যাপে গুড মর্নিং উইশটা আসুক না কেন, সংবাদপত্রের পাতা, এর গন্ধ, জড়ানো পাতা খুলতে পারার আনন্দ, নতুন খবর পরিবেশনের ভিন্নতা নিয়ে আমাদের সকালের তুমুল আগ্রহটা সকলের মধ্যে আজও বিদ্যমান। বাংলা ভাষায় আজ ছোট-বড় মিলিয়ে সংবাদপত্রের সংখ্যা নেহাত কম নেই। বাংলা সংবাদপত্রের পথচলার শুরুর সে দিন কিন্তু আজকের মতো এতটা মসৃণ ছিল না। নানা ঝড়ঝঞ্ঝা পেরিয়ে আজকের সংবাদপত্রের ঝাঁ-চকচকে রূপ। তবে প্রথম বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র বেরোনোর পর তার নানাভাবে পরিমার্জন ও পরিশোধন হয়েছে এবং নেপথ্যে যে-ব্যক্তিটির নাম বারে বারে করতে হয়, তিনি হলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য।

বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র কোনটি, তা নিয়ে ঐতিহাসিক কেন, সাধারণ বাঙালি থেকে পাঠকমহল সকলের মধ্যেই মতভেদ রয়েছে, একদল বলছেন 'সমাচার দর্পণ', আরেক দলের দৃঢ় মত 'বেঙ্গল গেজেট'। যদিও বেঙ্গল গেজেটের কিছু আগে সমাচার দর্পণের উন্মেষ ঘটেছিল, তথাপি বাংলার, বিশেষত বাঙালির প্রথম সংবাদপত্র হিসাবে বেঙ্গল গেজেট শীর্ষ স্থানেই থাকবে। সালটা ১৮১৮-র ১৫ মে, সুতানুটি, কলকাতা জুড়ে বাঙালিদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা, কেননা সেদিনই বের হল বেঙ্গল গেজেটের প্রথম সংখ্যা। সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে (শুক্রবারে) বের হতো কাগজটি। সরকারি নানান বিজ্ঞাপনসহ, আইন ও কর্মচারী নিয়োগ-সংক্রান্ত খবরাখবরসহ শহর কলকাতার টুকিটাকি লেখা থাকত সাধারণের জন্য সহজ, সরল কথ্যভাষায়। অন্যদিকে সমাচার দর্পণ-এর প্রকাশের নেপথ্যে ছিলেন শ্রীরামপুরের মিশনারীরা।

বেঙ্গল গেজেটের সঙ্গে যে-ব্যক্তিটির নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে তিনি হলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। ছোট থেকেই প্রকাশনার সঙ্গে তাঁর সহবত। সংবাদপত্রের দুনিয়ায় পা রাখার আগে বহুমুখী প্রতিভাধর গঙ্গাকিশোর কাজ করতেন শ্রীরামপুরের ছাপাখানায়। কিছুদিন কাজ করার পর মনে বার বার উঁকি দিতে লাগল বই প্রকাশের ইচ্ছা। ১৮১৬ সালে ফেরিস অ্যান্ড কোম্পানির ছাপাখানায় প্রকাশ করলেন 'অন্নদামঙ্গল'। এরপর থেকে মুদ্রণ আর প্রকাশনাই হয়ে উঠল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। এই গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের হাত ধরেই কলকাতার মুদ্রণজগতের পথচলার মূলত সূচনা। বই প্রকাশের কাজে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে রাখতে ক্রমশ তাঁর অন্তরের সৃজনশীল সত্তায় মনে হতে লাগল এবার বোধহয় বাঙালি পাঠকের হাতে সংবাদপত্র তুলে দেওয়ার সময় এসে গেছে। কেননা ততদিনে ইউরোপীয় রেনেসাঁর ঢেউ বাংলায় এসে পৌঁছেছে, নব্যবঙ্গদের আন্দোলন জোরদার হচ্ছে, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার— সব মিলিয়ে সমাজে আসছে অন্য এক ব্যাপ্ত পরিসর, যার পুরোধা ছিলেন রামমোহন-বিদ্যাসাগররা। তখনও পর্যন্ত কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতো না সেই অর্থে রসিক বা সাধারণ মানের বাঙালিদের জন্য কোনও সংবাদপত্র। সুতরাং পালের হাওয়া অনুকূলে বইবে— ভবিষ্যদ্বাণী বুঝে হাল ধরলেন গঙ্গাকিশোর। পাশে পেলেন হরিহর আত্মা বন্ধু হরচন্দ্র রায়কে। সেই সময় কাগজ বা বই ছাপানোর হ্যাপা বড় একটা কম ছিল না। ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুরা সে কাজে বারবারই বাধা দিতেন। সাহেবদের স্পর্শ লাগবে বলে কাগজে গঙ্গাজল ছিটিয়ে প্রায়শ্চিত্তও করা হতো তখনকার দিনে। বিদেশি-বিজাতীয়দের প্রেসে ছাপা, কাজেই তাকে ঘরে তুলতে বাধো বাধো ঠেকত অনেক হিন্দুরই।

কিন্তু কেমন ছিল বেঙ্গল গেজেট, সে আর আজ দেখার কোনও সুযোগ নেই। কেননা তথাকথিতভাবে তার কোনও সংরক্ষণই হয়নি। তবে আমাদের দেশে প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'বেঙ্গল গেজেট' স্বচক্ষে দেখেছিলেন। সে যাই হোক প্রকাশের পরে পরেই 'বেঙ্গল গেজেট' নিয়ে সংবাদপিপাসু বাঙালিদের মধ্যে তুমুল আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল। সারা সপ্তাহের খবর একসঙ্গে পড়তে পাওয়া তখনকার দিনে কম কথা ছিল না কি? কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর প্রচারিত দৈনিকে বাংলার সংবাদপত্রের ধারাবাহিক ইতিহাস একসময় লিখতে শুরু করেন, তাতে 'বেঙ্গল গেজেট'-এর মুকুটেই জুটেছে সম্মান, 'সমাচার দর্পণ'কে পিছনে ফেলে বেঙ্গল গেজেটই উঠে এসেছিল বাঙালির প্রথম সংবাদপত্র হিসাবে।

এরপর বাংলাভাষায় আরও যেসব উল্লেখ্য সংবাদপত্রের জন্ম হয়েছিল সেগুলি ছিল রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে 'সংবাদ কৌমুদি', ১২২৭ বঙ্গাব্দে, ১২২৮ সালে 'সমাচার পত্রিকা', বাবু নীলরত্ন হালদার কর্তৃক প্রকাশিত 'বঙ্গদূত' পত্রিকা। তবে যত যাই বেরোক 'বেঙ্গল গেজেট'-এর একটা আলাদা গৌরব ছিল, আরও গুছিয়ে বললে বলা যায় আলাদা জাত্যাভিমান, জৌলুস, এখনকার ভাষায় 'ক্লাস'। কিন্তু এহেন একটি সংবাদপত্রের পিছনে সর্বাধিক অবদান যে-ব্যক্তিটির ছিল সেই গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যর আজ পর্যন্ত কোনও জীবনী বাংলাতে নেই, সেটা ভাবতেই বড় অদ্ভুত লাগে। এত বড় উদ্যোগী পুরুষ, যাঁকে বাদ দিলে বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসটাই অসম্পূর্ণ, তাঁর কিনা আজ এই দশা। কতজন হতভাগ্য বাঙালি আমরা তাঁর নাম জানি? উত্তরটা দিতে গেলে আরও একবার মনে হয় ধরণী দ্বিধা হও। সত্যিই বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি।

এখন লক্ষ লক্ষ পাঠকের
সকালটা শুরু হয়...

আর
যুগশঙ্খ
দিয়ে

ইতিমধ্যেই কয়েক লক্ষ সচেতন পাঠক
তাঁদের সিদ্ধান্ত বদলেছেন

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১২ জুন ২০১৭

যুগশঙ্খ SUPPLI team
ক ল কা তা
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), তন্ময় মণ্ডল (সাব-এডিটর), সুদীপ্ত বিশ্বাস, অতনু পাল

নিমতলা মহাশ্মশান ঘাট

নীহারিকা

প্রসন্নকুমার ঠাকুর ঘাট থেকে রওনা দিলাম ভূতনাথ ঘাটের উদ্দেশ্যে, কারণ স্থানীয় কিছু মানুষ উত্তরদিকে দিক নির্দেশ করে জানালেন এরপরেই আপনাদের গন্তব্য হওয়া উচিত ভূতনাথ শিবমন্দির-সংলগ্ন ঘাট। অনেকটা পথ পায়ে হেঁটে সেখানে পৌঁছে মনের ভ্রম দূর হল। আসলে ওই নামের কোনও ঘাটই সেখানে নেই। জায়গাটার পরিচয় নিমতলা ঘাট। কলকাতার অন্যতম পরিচিত শ্মশানঘাট। উত্তর কলকাতায় বসবাসকারী মানুষরাই মূলত ব্যবহার করেন এই নিমতলা শ্মশানঘাট। বহুযুগ আগেই এই শ্মশানঘাটটির পত্তন হয়েছিল। জায়গার ইতিহাস সম্পর্কে খোঁজ করতে জানা গেল, এখানে মৃতদেহের ভেদাভেদ করা হতো। উচ্চবিত্ত পরিবারের মৃতদেহ দাহ করা হতো, কিন্তু যাঁরা নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ, অর্থাৎ যাঁদের আর্থিক সংগতি অনেকটাই কম, সেই মৃতদেহগুলি দাহ না করে, গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হতো। ঘাটের পাশেই নাকি ছিল গঙ্গাযাত্রীদের জন্য নির্ধারিত কয়েকটি ঘর। সেখান থেকেই মৃত্যুপথযাত্রী মুমূর্ষু রোগীদের চন্দ্রায়নের ব্যবস্থা করা হতো। এমনই এক চন্দ্রায়ন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথদেবশর্মনঃ। তাঁর দিদিমা অলকাসুন্দরীদেবীর মৃত্যুকালে তিনরাত্রি তাঁর কেটেছিল এই নিমতলা শ্মশানঘাটে।

কালের নিয়মে সবকিছুরই পরিবর্তন ঘটে। যতদিন গেছে শ্মশানচত্বরের পরিধি ততই বেড়েছে। দাহকার্যের প্রাঙ্গণের অদূরে গড়ে উঠেছে দূর-দূরান্ত থেকে আসা শবযাত্রীদের জন্য বিশ্রামাগার। হাল আমলে বর্তমান রাজ্যসরকার এবং কলকাতা পুরসভার উদ্যোগে সংস্কার করে নতুন করে সাজানো

নিমতলা ঘাটে বিসর্জন

হয়েছে নিমতলাঘাট। রবীন্দ্রনাথের সমাধিমন্দির চত্বরটি মাঝগঙ্গা পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়েছে। একইভাবে সজ্জিত হয়েছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের স্মৃতিমন্দিরটিও। পুরসভা নিয়ন্ত্রণাধীন শ্মশানে মানুষের সুবিধার্থে বৈদ্যুতিক চুল্লির সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে।

উত্তর কলকাতার এই অঞ্চলে এক বিপুল সংখ্যক অবাঙালির বাস। সেই কারণেই এখানে কাঠের চুল্লিতে মৃতদেহ সৎকার করা হয় নিয়মিত। সেই কারণে আশ-পাশের পরিবেশ যাতে দূষিত না হয়, সেইজন্য প্রতিটি কাঠের চুল্লির ওপরে লাগানো হয়েছে চিমনি। এগুলি নিঃসন্দেহে সাধু উদ্যোগ। শবযাত্রীদের ব্যবহৃত বিশ্রামগৃহটিরও প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। রবীন্দ্রস্মৃতি মন্দির দেখতে গিয়ে চোখে পড়ল বাংলা সাহিত্যের আরেক জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিসৌধ।

পাশেই ভূতনাথ শিবমন্দিরে সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিত পূজিত হচ্ছেন দেবাদিদেব মহাদেব। ভক্তসমাগমও হয় ভালোই। শ্মশান চত্বরে দাঁড়িয়েই শুনতে পাওয়া যায় মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি। এখান থেকে দু'পা এগোলেই পড়বে নিমতলা বিসর্জনের ঘাট। প্রতিবছর পুজোর মরশুমে উত্তর কলকাতার বিভিন্ন নামী সর্বজনীনের প্রতিমা নিমতলা গঙ্গাবক্ষে বিসর্জিত হয়। ঘাটে দাঁড়িয়ে চোখে পড়ল গঙ্গার জলে পড়ে রয়েছে একাধিক বর্জ্য পদার্থ যার মধ্যে বেশিরভাগটাই পুজোর কাজে ব্যবহৃত এবং পরিত্যক্ত ফুলের মালা, বেলপাতা ইত্যাদি। অন্যদিকে বিসর্জিত প্রতিমার কাঠামোও পড়ে আছে জলে। এখনও হয়তো পরিবেশবিদ বা দূষণের বিষয়ে সচেতন মানুষদের দৃষ্টি এখানে পড়েনি। গঙ্গার পারে এই এলাকায় রয়েছে অনেকগুলি দোকান। বেশিরভাগ দোকানেই বিক্রি করা হচ্ছে স্থানীয় ভূতনাথ মন্দিরে পুজো দেওয়ার সরঞ্জাম। খোঁজ করতে জানা গেল শ্মশান-সংলগ্ন এলাকায় আশ্বিনে শ্মশানকালীমাতার পুজোও আয়োজিত হয়।

নিমতলার পালা শেষ করে এবার চললাম আহিরীটোলার উদ্দেশ্যে। পথ চলতে সূর্যদেব যত ক্লান্তি দেন, ততই পবনদেব ক্লান্তিনাশ করেন। অনার্য গঙ্গার শীতল স্পর্শে তাই আমার চলাও থামে না। *ফোটো: লেখিকা*

খড়-মাটির চেনা ছন্দ

পান্থজন

বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, উমিচাঁদের দাড়ি এবং গোবিন্দ মিত্তিরের ছরি সম্পর্কে। এক সময়ে চিৎপুরের এই মৃৎশিল্পের অঞ্চল কুমোরটুলির বেশিরভাগটাই ছিল গোবিন্দ মিত্রের অধীনে। বিখ্যাত বনমালী সরকার স্ট্রিটের মধ্য দিয়ে গঙ্গার দিকে যেতে পড়বে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার ভাগ্যকূলের জমিদার পরিবারের পঙ্কজ রায়ের পৈতৃক বাড়ি। বনমালী সরকার স্ট্রিট থেকে কুমোরটুলির গঙ্গার ঘাট এবং ঢাকেশ্বরী মন্দির আর কাশীমিত্র ঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত মৃৎশিল্পীদের বসতি এবং স্টুডিও। বহুকাল ধরেই এখানে ঠাকুর তৈরি হয়। সারা বছর ধরেই চলে ব্যস্ততা। পুজো-পার্বণের সময় হলে তো কথাই নেই। চলতে চলতে চিৎপুরের ট্রামলাইন ধরে কিছুটা এগিয়ে সোজা ঢুকে গেলাম বাঁদিকে বনমালী সরকারের গলির মধ্যে। উপন্যাসের পাতায় পড়া দৃশ্য এবং বাস্তবের দেখার মধ্যে অনেক তফাত। এখানে পথের দু'ধারে সারা বছরই মাটির এবং খড়ের গন্ধ।

পুজোর এখনও কয়েকমাস দেরি, তবুও কুমোরদের ঘরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে প্রস্তুতি। বাঁধা হচ্ছে কাঠামো। অনেকক্ষেত্রে খড়ের কাঠামোয় মাটির প্রলেপ পড়ে গেছে। অতি দ্রুত মৃণ্ময়ীরূপে প্রকাশিতা হচ্ছে দশপ্রহরণধারিণী। ব্যাপার দেখে মনে হল এমন হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। হাতে সময় থাকলেও অগণিত সংখ্যায় নির্মিত হয় বৃহৎ দুর্গামূর্তি। তাই অনেক আগেই এর প্রস্তুতি শুরু করা দরকার। আগে জানতাম শাস্ত্রের নিয়ম মেনে রথযাত্রার দিন কাঠামো পুজো হতো আর মহালয়ার দিনে হতো চক্ষুদান। কিন্তু এখন সবটাই উলটো। মজার ব্যাপার হল চতুর্থী বা পঞ্চমীর তিথিতে যখন কলকাতা সহ সারা রাজ্য সেজে ওঠে, তখন এই এলাকায় নেমে আসে অন্ধকার। কুমোরদের চোখে এবং শরীরে ক্লান্তি, কয়েকমাস ধরে এঁদের হাতেই সুসজ্জিতা হয়ে দেবী চলে গেছেন বাড়ির ঠাকুরদালানে বা পাড়ার মণ্ডপে। তাই শূন্য ঘরে নেমে আসে বিষণ্ণ পরিবেশ, আর সেই পরিবেশেই বিশ্রামের জন্য ঘুমিয়ে পড়েন তাঁরা। এ যেন সূচনা লগ্নেই বিসর্জনের রেশ। নাহ্, এসব

আলোচনা করার সময় এখনও আসেনি। অপেক্ষা আরও কিছুদিনের।

অনেককাল ধরেই খবরের কাগজের পাতায় দেখে আসছি, সরকারি উদ্যোগে নাকি এখানকার অস্থায়ী ছাউনি ভেঙে তৈরি করা হবে স্থায়ী স্টুডিও। একই সঙ্গে মৃৎশিল্পীদের নাকি পুনর্বাসনও দেওয়া হবে। রোদ, বৃষ্টি আর কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না। চার-পাঁচ পুরুষ ধরে কাজ করে আসা শিল্পীরা অবশেষে পাবেন তাঁদের স্থায়ী ঠিকানা এই কুমোরটুলির মাটিতেই। অনেক সরকারি এবং রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির মতো এই প্রতিশ্রুতিও দিনের আলো দেখেনি। কবে দেখবে তাও জানা যায় না। এরই পাশাপাশি রয়েছে একাধিক শোলার সাজের দোকান। রাজ্যের বাইরে থেকেও এখানে কাঁচামাল সরবরাহ করা হয়।

শুধুই কি দুর্গা? এখানেই বছরের বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠে কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, মনসা, কার্তিক, গণেশ ইত্যাদি। দেব-দেবীর পাশেই আছেন মহাপুরুষের দল। চিৎপুরের পাথরের এলাকায় যেমন দেখেছিলাম, তেমনই এখানেও দেখলাম রবীন্দ্রনাথ, মা সারদা, লোকনাথ, রামকৃষ্ণদেবের মূর্তি। তফাৎ শুধু এই যে পাথরের পরিবর্তে তাঁরা মাটির ছোঁয়ায় প্রকাশিত। এইবার জানবো পাল শিল্পীদের অতীতের কিছু কথা। দক্ষিণের পটুয়াপাড়ায় যেমন ঠাকুর গড়া হয় তেমনই, প্রতিমা নির্মাণের কাজ কুমোরটুলিতেও শুরু হয়েছিল অনেক আগে। বিভিন্ন জায়গা থেকে বাগবাজার ঘাটে মাটি আসে আর তার সঙ্গে মেশাতে হয় এঁটেলমাটি। খড় আসে সুন্দরবন থেকে নৌকাপথে গঙ্গায়। কারিগরেরা আগে আসতেন কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, নৈহাটি, কেউ-বা আবার মেদিনীপুর থেকে।

একসময় বাংলাদেশের কারিগরদেরও আনাগোনা ছিল। এখনও আগের মতোই দূরের শিল্পীরা মুখ্যশিল্পীদের কাছে থেকে যান কাজের মরশুমে। দিনমজুরি ও খাওয়া-থাকার বিনিময়ে। দেশ বিভাগের পরে মোহনবাঁশি রুদ্রপালের মতো অনেক শিল্পীই ওপার বাংলা থেকে এসে এপারে ঠাকুর গড়ার কাজ শুরু করেছেন। বহুকাল ধরে কুমোরটুলির শর্পিল ঘুলঘুলির মধ্যে এঁদের বাস। যত জানা যায় ততই অবাক হতে হয়। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, চৈত্রমাস থেকেই নাকি দীপান্বিতা কালীপুজোর জন্য যায় প্রতিমা গড়া শুরু হয়ে, কারণ তারপরে আর সময় পাওয়া যায় না।

দেখতে দেখতে চলে আসে দুর্গাপুজো। আর তারপরেই কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয় ঠাকুর গড়ার চাপ থাকে প্রবল। বাদবাকি সময়ের মধ্যে বিপুল সংখ্যক কালীপ্রতিমা গড়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই আগে থাকতেই এই প্রস্তুতি। কুমোরটুলির সীমানা অতিক্রম করে এবার এগিয়ে চললাম বড় রাস্তার উদ্দেশে। রাস্তার ওপারে মন্দিরে অধিষ্ঠিতা রয়েছেন এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা। আগামী পর্বে তাঁর কথা।

ফোটো: লেখক

যুগশঙ্খ
SUPPLI
সোমবার, ১২ জুন ২০১৭

ট্রাফিক পুলিশ নিজেদের দায়িত্ব কতটা পালন করে?

তন্ময় মণ্ডল

উত্তর থেকে দক্ষিণ শহর কলকাতার পরিসর বেড়েছে। দিনকে দিন বাড়ছে জনঘনত্ব, বাড়ছে গাড়ি-ঘোড়া। ঐতিহ্যপূর্ণ শহর কলকাতার বিশেষত্ব অনেক। তার একটা হল জ্যাম। সকালে অফিসে বেরনো যাত্রী জানেন, দেরি করে অফিস যাওয়ার জন্য বসের কাছে গালিগালাজ খাওয়ার পিছনে রোজ যেমন তার বিশেষ হাত থাকে না, বসও সেকথা জানেন ততটাই। হ্যাঁ, সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, শহরের অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা মহাত্মা গান্ধী রোডে অফিস টাইমে গাড়ির গতি ঘণ্টায় বড় জোর ৯ কিলোমিটার। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডে ঘণ্টায় আঠেরো কিলোমিটার, আরজি কর রোডেও তাই। গাড়ির গতি সবচেয়ে বেশি বিবেকানন্দ রোডে, ঘণ্টায় চল্লিশ কিলোমিটার। অর্থাৎ, অফিস টাইমে কলকাতার রাস্তায় গাড়ির গড় গতি বড়জোর সাইকেলের সমান! সারা দেশের অন্যান্য শহরগুলোর তুলনায় কলকাতাতেই এই সমস্যা সর্বাধিক। এখন প্রশ্ন হল এই নিত্য দিনকার সমস্যার কি সুরাহা নেই? প্রশ্ন উঠছে মাঝেমাঝেই ট্রাফিক পুলিশের দায়বদ্ধতা নিয়ে। কেউ কেউ বলছেন ট্রাফিক পুলিশের সক্রিয়তা অনেক কম। প্রশ্ন উঠছে ট্রাফিক আইন নিয়ে ক্ষমতার অপব্যাবহারের। আদতে ট্রাফিক পুলিশ কতটা নিজেদের দায়িত্ব পালন করে? তাহলে কেন এত প্রশ্ন? কেন এত অসন্তোষ? এই নিয়েই আজকের যুক্তি-তর্ক-আড্ডা।

বিপ্লব পাল (নিত্যযাত্রী): আমি রোজ বাইক নিয়ে অফিস যাই দক্ষিণেশ্বর থেকে গড়িয়াহাট। সারা রাস্তায় যেমন গাড়ি তেমন জ্যাম। অনেক ঘটনাই চোখের সামনে দেখি। তার কয়েকটার সাক্ষী আমি নিজেও। সার্জেন পান চিবোতে চিবোতে অর্ডার করছেন, দু'জন ট্রাফিক পুলিশ জ্যাম ছাড়াতে লাগলেন। সার্জেনের চ্যাচানির এফেক্ট হয়তো গিয়ে পড়ল কোন বাইক আরোহীর ওপর। আর একবার যার ওপর কোপ পড়ল মানে ফাইন। আমি নিজে দুবার সিগনাল ব্রেক না করেও ফাইন দিয়েছি।

শ্যামল দাস (ট্যাক্সি চালক): ট্রাফিক পুলিশ মানে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের কাছে ত্রাস। ভয়ে ভয়ে থাকি সবসময়। কারণ তারা কেস বানায় আর সঙ্গে সঙ্গে ফাইন। সামনের পিছনের পকেটের কথা তো আর নতুন করে কিছু বলার নেই। আমি নিজেই অনেকবার এমন দেখেছি, ৩৫০ টাকার ফাইন ১৫০তে রফা হয়ে যাচ্ছে, রসিদ না নিলে। আর জ্যামের ব্যাপারে আর কী বলব সে তো শহরের রোজকার সমস্যা। সেখানে তারা তাদের ভুমিকা পালন করেন যতটা করা উচিত। তবে একটা জিনিস খুব ভয়ংকর যে যদি ট্রাফিক গাড়ি সাইড করতে বললো মানে কোনও না কোনও কারণ দেখিয়ে ফাইন হবেই।

দেবাশিষ বিশ্বাস (পথচারী): আমার তো সকাল থেকে রাত কলকাতার রাস্তায় কাটে। ফলে সকালবেলা যেমন ট্রাফিক-সিগন্যাল-জ্যাম দেখি ঠিক তেমনি রাতে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময়ও। একটা জিনিস আমার কাছে কেন সবার কাছে স্পষ্ট যে, ট্রাফিক পুলিশ চাইলেই এত জ্যাম এত যানজট অনেকটাই কমতে পারে। প্রশাসনের সিস্টেমে যেমন গলদ আছে এনাদের ডিউটি তো আসলে মনমানি। একটা কথা ভাবতে অবাক লাগে জ্যামে আটকে সিগন্যালে বাসে বসে আমি রবীন্দ্রসংগীত শুনব, যখন আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে কোথাও যাবার আছে? ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত। প্রশাসনের এই উন্নত প্ল্যান যদি ছেড়েও দিই যারা ট্রাফিক পুলিশ, রাস্তার মানুষের যাতায়াতটা যাতে স্মুদলি হয়, এটা যাদের দেখবার কথা তারা সেটা নিয়ে কতটা ওয়াকিবহল আমার সন্দেহ আছে।

সৌমিক সেনগুপ্ত (অ্যাডিশনাল ওসি, তিলজলা): কলকাতার ট্রাফিকের দায়িত্ব নিয়ে যদি বলি তাহলে বলব তারা তাদের হান্ড্রেড পারসেন্ট দায়িত্ব পালন করে। অনেকে অনেক কিছুই বলে থাকেন ট্রাফিক সম্পর্কে তবে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের ব্যবস্থানায় অতটা অসংগতি নেই। রাস্তা-ঘাটে সমস্যায় পড়া মানুষের পাশেও তারা দাঁড়ায়, তার অনেক উদাহরণও আছে। একটা ঘটনার কথা বলতে পারি এই তো কদিন আগে ব্র্যাবোর্ন রোডে একজন লোকের মিনিবাসে যেতে যেতে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছিল, তাকে বাস থেকে নামিয়ে হসপিটাল নিয়ে গিয়ে, মানে একদম প্রাইম-টাইমে নিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচিয়েছি। পেপারেও বেরিয়েছিল সেই খবর।

রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দফতরের ওয়েবসাইট

- **রাজ্য সরকার**, নবান্ন, হাওড়া-৭১১১০২ (**www.banglarmukh.com**)
- **পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর**, জেসপ বিল্ডিং, ৬৩ এন এস রোড, কলকাতা-১ (**www.wbprd.nic.in**)
- **অর্থ দফতর**, নবান্ন, হাওড়া -৭১১১০২ (**www.wbfin.nic.in**)
- **স্বাস্থ্য দফতর**, স্বাস্থ্য ভবন, জিএন-২৯, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbhealth.gov.in**)
- **পরিবেশ দফতর** (**www.enviswb.gov.in**)
- **পূর্ত দফতর** (**www.pwdwb.in**)
- **পরিবহন দফতর**, পরিবহন ভবন, ১২ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-১ (**www.vahan.wb.nic.in**)
- **কৃষি দফতর**, নবান্ন, হাওড়া-৭১১১০২ (**www.wbagrisnet.gov.in**)
- **সেচ দফতর**, জলসম্পদ ভবন, ব্লক-ডিএফ, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbiwd.gov.in**)
- **সমবায় দফতর** (নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, কলকাতা-১ (**www.coopwb.org**)
- **মৎস্য দফতর**, ৩১, ব্লক-জিএন, সেক্টর-৫, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbfisheries.gov.in**)
- **প্রাণী সম্পদ দফতর**, এলবি-২, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbard.gov.in**)
- **খাদ্য দফতর**, খাদ্য ভবন, ১১এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা-৮৭ (**www.wbfood.gov.in**)
- **শিক্ষা দফতর**, বিকাশ ভবন, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbsed.gov.in**)
- **তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর**, নবান্ন, হাওড়া-৭১১১০২ (**www.tathyabangla.gov.in**)
- **যুব কল্যাণ দফতর**, ৩২/১ বিবিডি বাগ (সাউথ), স্ট্যান্ডার্ড বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, কলকাতা-১ (**www.wbyouthservices.in**)
- **নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দফতর**, বিকাশ ভবন, নর্থ ব্লক, দশম তল, সেক্টর-২, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbsc.gov.in**)
- **বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর** (**www.wbdma.gov.in**)
- **ক্ষুদ্র শিল্প দফতর** (**www.mssewb.org**)
- **বিদ্যুৎ দফতর**, বিদ্যুৎ ভবন, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbpower.nic.in**)
- **অচিরাচরিত শক্তি দফতর**, নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, কলকাতা-১ (**www.wbreda.org**)
- **সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর**, অম্বর, ডিডি-২৭/ই, সেক্টর ১, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbmdfc.org**)
- **অনগ্রসর কল্যাণ দফতর**, প্রশাসনিক ভবন, এসডিও বিধাননগর, চতুর্থ তল, ডিজে-৪, সেক্টর-২, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.anagrasarkalyan.gov.in**)

প্রয়োজনে লাগতে পারে

সেন্ট জন্স অ্যাম্বুলেন্স - ২২৪৮৫২৭৭

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (অ্যাম্বুলেন্স) - ২২৩৯২২৩২, ২২৩৯২২৩৩

বেল ভিউ নার্সিং হোম - ২২৪৭৭৪৭৩, ২২৪৭২৩২১

কোঠারি মেডিক্যাল সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট - ২৪৫৬৭০৫০, ২৪৭৯২৫৬১

ক্যালকাটা হসপিটাল অ্যান্ড মেডিক্যাল রিসার্চ - ২৪৫৬৭৭০০, ২৪৭৯১৮০৫

এসএসকেএম হসপিটাল (পিজি) - ২২২৩৬০২৬, ২২২৩৬২৪২

ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ - ২২৪১৯০১, ২২৪১৪৯০৪

বিএম বিড়লা হার্ট রিসার্চ সেন্টার - ২৪৫৬৭০০১, ২৪৫৬৭০০৫

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল - ২৫৫৫৭৬৭৬, ২৫৫৫৭৬৫৬

এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল - ২২৪৪৩২১২, ২২৪৪৩২১৭

পিয়ারলেস হসপিটাল - ২৪৬২২৩৯৪, ২৪৬২২৪৬২

উডল্যান্ডস - ২৪৫৬৭০৭৯, ২৪৫৬৭০৭৬

রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান - ২৪৭৫৩৬৩৬, ২৪৭৫৩৬৩৮

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ১২ জুন ২০১৭

এই ক্রোড়পত্রের সমস্ত লেখার মতামতই লেখকদের নিজস্ব।

কল্পনার সেই কলকাতা শহরে

লোকমান আহমদ আপন
(ছড়াকার ও সাংবাদিক)

কলকাতা নিয়ে ছোটবেলায় অনেক গল্প শুনেছি। আমার দাদা, নানা ও বড় চাচা অভিভক্ত ভারতের কলকাতায় চাকরি করেছেন। সে গল্প আমার আব্বা-আম্মার কাছে শুনেছি বহুবার। আমাদের স্থানীয় ভাষায় কলকাতাকে বলা হয় 'কলিকাত্তা'। এই কলিকাত্তার প্রতি আমার দুর্নিবার আগ্রহ কাজ করত সব সময়। ইন্ডিয়া বা ভারত নামটা শোনার সাথে সাথে চোখের সামনে ভেসে উঠত কলকাতার ছবি। যে ছবির পুরোটাই ছিল কাল্পনিক। কল্পনার সেই কলকাতা শহরে আমি অনেক পরে। ২০১৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর। এদিন ঢাকা-কলকাতা রোডে চলাচলকারী মৈত্রী পরিবহণের দুটো বাস রিজার্ভ করে আমরা কলকাতা যাই। ঢাকার ঐতিহ্যবাহী সিলেটি সামাজিক সংগঠন 'জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন' কলকাতায় আয়োজন করেছিল বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এই সিলেট উৎসব। যা ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর কলকাতার যোধপুর পার্ক স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব অ্যাটেন্ড করতেই আমার প্রথম কলকাতায় যাওয়া। এই উৎসবে বাংলাদেশের এবং সারা বিশ্বের সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, শিক্ষা সহ সর্বশ্রেণির শতশত সিলেটি অংশগ্রহণ করেছিল।

বাংলাদেশের বেনাপোল ও ভারতের পেট্রাপোলের দু-দুটো ইমিগ্রেশন শেষ করে বাস ভারতে ঢোকে বিকেল পাঁচটায়। বাস ভারতে ঢোকার সাথে সাথে আমি অস্থির হয়ে উঠি উত্তেজনায়। রাস্তার দু'পাশে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যশোর রোডের বড় বড় রেইন ট্রি গাছগুলোকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছিল বারবার। এই রোড দিয়ে একাত্তরে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ভারতে ঢুকেছিল। বারবার মনে পড়ছিল বিখ্যাত মর্কিন কবি অ্যালেন গিন্সবার্গের 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' কবিতাটি। বারবার কানে ধ্বনিত হচ্ছিল মৌসুমী ভৌমিকের গাওয়া সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড কবিতা অবলম্বনে বানানো 'যশোর রোড' শিরোনামের মর্মস্পর্শী গানটাও। চলন্ত বাস থেকে দু'পাশের গাছপালা, মাটি আর সার্বিক প্রকৃতি দেখে মনেই হয়নি এটা ভিন্ন কোনও দেশ। মনে হয়েছে এতো আমারই দেশ, আমারই বাংলা, আমারই মাতৃভূমি। বারবার মনে হয়েছে ভাগ্যের নির্মম পরিহাসেই আমাদের প্রাণের বাংলা এখন দ্বিখণ্ডিত।

রাত ন'টার দিকে বাস কলকাতার সল্টলেকের আন্তর্জাতিক বাস টার্মিনালে পৌছয়। সেখান থেকে ছোট বাসে করে আমাদের পার্ক স্ট্রিটের হোটেল রয়াল গার্ডেনে পৌছে দেওয়া হয়। আমি আমার রুমে চেক ইন করেই বেরিয়ে পড়ি কলকাতার রাস্তায়। ফুটপাত দিয়ে হাঁটি অনেকক্ষণ। পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে একটি চায়ের দোকানে কিছুক্ষণ বসি। চা-সিগারেট খাই। সেখানেই আমার প্রথম পরিচয় ঘটে চা খাওয়ার মাটির কাপের সাথে।

পরদিন খুব সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আবার কলকাতার রাস্তায় নেমে পড়ি। এই প্রথম সরাসরি পরিচয় ঘটে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ট্রামের সাথে। বাংলা গল্প-উপন্যাস কিংবা কবিতায় এই ট্রামের কথা অনেক পড়েছি। প্রথম দর্শনে তাই বেশ উত্তেজনা কাজ করে আমার। মোবাইল ক্যামেরায় বেশ কিছু ছবি তুলে নেই চলন্ত ট্রামের। হঠাৎ এক জায়গায় ট্রাম থামলে দ্রুত উঠে পড়ি আমি। গন্তব্যহীন যাত্রায় বেশ কিছুদূর চলে যাই। তারপর

একজায়গায় নেমে আবার উল্টোদিকের ট্রামে চড়ে বসি। বিকেলে চলে যাই প্রোগ্রাম ভেন্যু যোধপুর পার্ক স্কুল মাঠে। অনেক আনন্দ করে রাতে হোটেলে ফিরি।

২৮ ডিসেম্বর ২০১৫ ছিল উৎসবের শেষদিন। সকালে মেট্রোতে চড়ে রবীন্দ্র সরণি হয়ে জোড়াসাঁকোতে যাই। সেখানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মভিটেয় কিছুক্ষণ কাটাই। সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সরাসারি পৌছে যাই যোধপুর পার্কের উৎসবে।

২৯ ডিসেম্বর ছিল আমাদের ফ্রি ডে। এদিন যে যার মতো করে বেড়াবে, শপিং করবে। কেউ কেউ ভারতের অন্যদিকে বেড়াতে যাবে, কেউ কেউ চলে যাবে দেশে। আমি, বাদল ভাই, প্রোফেসর মালেক ভাই আর তাঁর স্ত্রী রাতেই ঠিক করে রাখি কাল শান্তিনিকেতন যাব। পরদিন খুব ভোরে হাওড়া রেলস্টেশন থেকে রওনা দিয়ে দুপুরের আগেই শান্তিনিকেতন পৌছে যাই। সারাদিন শান্তিনিকেতন থেকে বিকেলের ট্রেনে চড়ে সন্ধার পরে এসে শিয়ালদহ রেলস্টেশনে নামি। সেখানে আমার অপেক্ষায় ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট লেখক, নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সংসদের অন্যতম সংগঠক আনসার উল হক। তাঁর সাথে দেখা হলে, তিনি আমাকে বেশ কিছু বই ও পত্রিকা উপহার দেন। আনসারদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিউ মার্কেটে কিছু শপিং করে হোটেলে ফিরে দেখি আমার ল্যাপটপ চুরি হয়ে গেছে। সেই সাথে চুরি হয় ল্যাপটপের ব্যাগে রাখা আমার পাসপোর্টও। আকাশ ভেঙে পড়ে মাথায়। এ কী হল? কাল সকালের মৈত্রী বাসে আমার ফিরে যাওয়া কনফার্ম, অথচ পাসপোর্ট চুরি হয়ে গেছে। এখন কী হবে আমার? কীভাবে দেশে ফিরবো, কীভাবে ভারতে থাকব? কিছুই মাথায় ঢুকছে না আমার।

এরপরের অভিজ্ঞতাটুকু শুধু অম্ল-মধুরই নয়, আমার জীবনের অনেক বড় স্মৃতি হয়ে আছে। সেগুলো পরে সময় সুযোগ পেলে লিখবো। এরপরে আমি আরও তিনবার কলকাতা ভ্রমণ করেছি। সেইসব ভ্রমণেও হয়েছে বিচিত্র আর মজার সব অভিজ্ঞতা। সেগুলোও সময় সুযোগ মতো লিখব।

রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন

বুদ্ধদেব হালদার

'দশ বছর বয়সে অবিনাশ এবং আমি একদা আমাদের বাড়ির ধারে চড়ক উৎসবের খোলা মাঠটায় দাঁড়াইয়া— জীবনে কে কী করিব তাহাই আলোচনা করিতেছিলাম। অবিনাশ বলিল, আমি জমিদার হইব, শত শত লোক আমার পাছে পাছে ঘুরিবে, আমরা বড় জমিদার ছিলাম, আমি সেই নষ্ট প্রতিষ্ঠার উদ্ধার করিব। আমি বলিলাম, আমি কবি বা গ্রন্থকার হইব, কুঁড়ে ঘরেও যদি থাকি, তবে সেই কুঁড়ে ঘরের নিকট যাবতীয় জ্ঞানী মাথা নোয়াইবেন।'—এই প্রতিজ্ঞা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে যে বালক একদিন উচ্চারণ করেছিলেন সংগ্রামের মহামন্ত্র, তিনি সমস্ত বাংলা জাতি ও ভাষা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাসকার রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন। ১৮৬৬ সালের ৬ নভেম্বর ঢাকা জেলার অন্তর্গত বগ্‌জুড়ি গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। পিতা ঈশ্বরচন্দ্র সেন মানিকগঞ্জ আদালতের উকিল ছিলেন। মাতা শ্রীমতী রূপলতা দেবী। দীনেশচন্দ্রের পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার সুয়াপুর গ্রাম। স্বাধীনতা উত্তরকালের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক সমর সেন তাঁর পৌত্র।

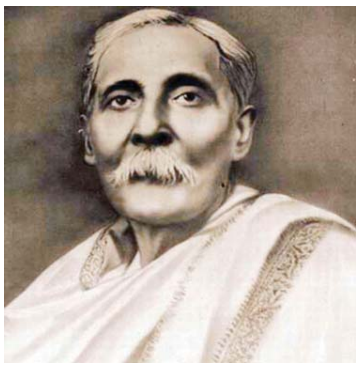

শৈশবে দীনেশচন্দ্র সেনের সাহিত্যিক সত্তাকে খুব বেশি মাত্রায় প্রভাবিত করেছিল মাতামহ গোকুল মুন্সীর প্রাসাদোপম গৃহের সাড়ম্বরে পালিত সেই সময়ের নানান যাত্রা, কথকতা, কবিগান, পদাবলি কীর্তন সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান। সুয়াপুর গ্রামে বিশ্বম্ভর সাহার পাঠশালায় তাঁর শৈশব শিক্ষা পূর্ণ হয়। এরপর তিনি মানিকগঞ্জে চলে আসেন ও স্থানীয় 'মাইনর' স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৭৯ সালে তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় সফল হন। এই সময় কিছুদিন কুমিল্লা এন্ট্রান্স স্কুলে পড়াশোনা করার পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন। ১৮৮১ সালে 'ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল' থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ১৮৮৩ তে এল.এ. পরীক্ষা সম্পূর্ণ করেন। ঢাকা কলেজে বি.এ. পড়বার সময় ১৮৮৬ তে তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটে। ১৮৮৭ সালে প্রাইভেট ছাত্ররূপে তিনি ইংরেজিতে অনার্স সহ বি.এ. পাশ করেন।

তাঁর প্রথম কবিতা 'সরস্বতী স্তব' মাত্র ৭ বছর বয়সে তিনি রচনা করেছিলেন। ঠিক এই সময়েই নান্নার থেকে প্রকাশিত 'ভারত সুহৃদ' পত্রিকায় তাঁর 'জলদ' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। ঢাকা কলেজে এল.এ. পড়ার সময় তিনি 'Epiphany', 'নবজীবন', 'জন্মভূমি' 'অনুসন্ধান' সহ তৎকালীন বহু বিখ্যাত পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। ১৮৯১ থেকে তাঁর সাহিত্য বাংলার শিক্ষিত সমাজকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করতে থাকে। দীনেশচন্দ্র সেন ছাত্রাবস্থায় ইংরেজি সাহিত্যের একটি পরিপূর্ণ ইতিহাস লেখার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎই তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়নে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করলেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশিত হওয়ার পর দীনেশচন্দ্র বাংলার সর্বত্র পরিচিত হয়ে উঠলেন এবং তাঁর এই গ্রন্থটি জাতীয় সম্পদরূপে স্বীকৃত হল।

১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি সপরিবারে কলকাতায় এসে শ্যামপুকুর স্ট্রিটের একটি ভাড়াবাড়িতে বসবাস করতে শুরু করেন। এই সময়ে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। ১৯০৩-এ তাঁর 'রামায়ণী কথা' বই আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর 'সতী', 'বেহুলা','ফুল্লরা', 'ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ' প্রভৃতি বই প্রকাশ পেতে থাকে। ১৯০৯-এ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 'রিডার' হিসাবে নিযুক্ত হন। ওই সময়েই প্রকাশিত হয় তাঁর 'History of Bengali Language and Literature'(১৯১১)। এরপরেই প্রকাশিত হয় 'Typical Selections from Old Bengali Literature'। পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই গ্রন্থের সাহায্যেই বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯১০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯২০ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদের দায়িত্ব সামলে ছিলেন।

তিনিই প্রথম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি পূর্ণ ইতিহাস রচনা করেছিলেন, যা বিশ্বের কাছে বাংলার সার্বিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে প্রকাশ করতে সফল হয়েছিল।' ভারত' (১৯২২), 'কথা ও যুগ সাহিত্য' (১৯২২), 'বঙ্গ' (১ম ও ২য় খণ্ড) (১৯৩৫), 'স্মৃতিকথা' (১৯৩৬), 'মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা', 'Chaitanya and His Companions' (1917), 'The Folk Literature of Bengal' (1920), 'The Bengali Ramayana' (1920), 'Bengali Prose Style, 1800-1857' (1921), 'Chaitanya and His Age' (1922) তাঁর লেখা প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, যা বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসাবে স্বীকৃত।

১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে ডি.লিট. উপাধি এবং ১৯৩১-এ 'স্বর্ণপদক' সম্মান প্রদান করা হয়। ১৯২১ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৩৯ সালের ২০ নভেম্বর বেহালার রূপেশ্বর ভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য তিনি যেভাবে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে গেছেন তা সমগ্র জাতির কাছে এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত হয়ে রয়ে যাবে আজীবন।